সোফির জগৎ

ইয়স্তাইন গার্ডার

অনুবাদ: জী এইজ হাবিব

নন্দন কানন

...কোনো এক পর্যায়ে কোনো একটা কিছু নিশ্চয়ই শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছিল...

স্কুল থেকে বাসায় ফিরছে সোফি অ্যামুন্ডসেন। প্রথমে, খানিকটা পথ, জোয়ানার সঙ্গে হাঁটছিল সে। রোবট নিয়ে কথা বলছিল ওরা। জোয়ানার ধারণা, মানব-মস্তিষ্ক উন্নত একটা কম্পিউটারের মতো। সোফি ঠিক সায় দিতে পারছিল না ওর কথায়। মানুষ নিশ্চয়ই স্রেফ এক টুকরো হার্ডওয়্যার নয়?

সুপারমার্কেট পর্যন্ত এসে দু'জন যার যার পথ ধরল। এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়া একটা শহরতলির প্রান্তে থাকে সোফি, জোয়ানার বাসা থেকে স্কুলের দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বে। ওর বাগানের পরে আর কোনো বাড়ি নেই। আর তাতে করে মনে হয় ওর বাসা যেন পৃথিবীর একেবারে শেষ প্রান্তে। এখান থেকেই বনের শুরু।

মোড় ঘুরে ক্লোভার ক্লোজে পড়ল সোফি। রাস্তাটার শেষ মাথাটা হঠাৎ বেকে গেছে। উইকেন্ড ছাড়া লোকজন খুব একটা যায় না ওদিকে।

মে মাস শুরু হয়েছে মাত্র। ড্যাফোডিলের ঘন ঝাড়গুলো ফলের গাছগুলোকে ঘিরে আছে কিছু কিছু বাগানে বার্চ গাছে এরই মধ্যে দেখা দিয়েছে হালকা সবুজ পাতা।

বছরের এই সময়টাতে সবকিছু যে কীভাবে এক সঙ্গে প্রাণ পেয়ে ওঠে তা সত্যি আশ্চর্যের! উষ্ণতা পেলেই আর তুষারের শেষ চিহ্ন অদৃশ্য হয়ে যেতেই প্রাণহীন মাটির ভেতর থেকে সবুজ গাছপালার এই দঙ্গল লকলকিয়ে ওঠে কেন?

বাগানের গেটটা খুলে চিঠির বাক্সে উকি দিল সোফি। সাধারণত বেশ কিছু সাদামাটা চিঠিপত্র আর কয়েকটা বড়সড় খাম থাকে তার মায়ের জন্যে, সেগুলো সে রান্নাঘরের টেবিলে ডাই করে ফেলে রেখে তার কামরায় উঠে যায় হোমওয়ার্ক শুরু করতে।

মাঝে মধ্যে কিছু চিঠি আসে তার বাবার কাছে, ব্যাংক থেকে। কিন্তু তাই বলে ভাববার কোনো কারণ নেই যে তার বাবা আর দশজন বাবার মতো সাধারণ কোনো লোক। একটা বড় অয়েল ট্যাংকারের ক্যাপ্টেন তিনি, বছরের বেশির ভাগ সময় বাড়ির বাইরেই কাটান। অল্প যে কটা হপ্তা তিনি একটানা বাড়িতে থাকেন, সোফি আর তার মায়ের জন্য বাড়িটাকে সুন্দর ও আরামদায়ক করার কাজেই ব্যয় করেন সময়টা। কিন্তু যখন সমুদ্রে থাকেন, তখন তাকে যেন খুব দূরের মানুষ বলে মনে হয়। চিঠির বাক্সে মাত্র একটা চিঠি এবং সেটা সোফির জন্যে। সাদা খামটার ওপর লেখা সোফি অ্যামুন্ডসেন, ৩ ক্লোভার ক্লোজ।' ব্যাস, এই। কে পাঠিয়েছে তা লেখা নেই। এমনকি কোনো ডাকটিকেটও নেই খামটার ওপর।

গেটটা বন্ধ করে দিয়ে খামটা খুলল সোফি। মাত্র এক টুকরো কাগজ সেটার ভেতর, খামের চেয়ে কোনোভাবেই বড় হবে না সেটা। তাতে লেখা কে তুমি?

কেবল এই দুটো শব্দ আর কিছু না, হাতে লেখা, শেষে একটা বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন। আবার তাকাল সোফি খামটার দিকে। চিঠিটা যে তার কাছেই লেখা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কে রাখতে পারে ওটা চিঠির বাক্সে?

দ্রুত লাল বাড়িটার ভেতর ঢুকে পড়ে সোফি। সে দরজা বন্ধ করার আগেই তার বেড়াল শিয়ার্কান বরাবরের মতো ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে, সামনের সিঁড়িতে লাফ দিয়ে পড়ে চট করে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

মনমেজাজ খারাপ থাকলে সোফির মা বাড়িটাকে বলেন 'মিনেজারি'; মিনেজারি হচ্ছে পশুপাখির একটা সংগ্রহ। সোফির একটা মিনেজারি আছে এবং সেটা নিয়ে সে বেশ সন্তুষ্টও বটে। তিনটে গোল্ডফিশ নিয়ে শুরু হয়েছিল সংগ্রহটা—গোল্ডটপ, রেড রাইডিংহুড আর ব্ল্যাকজ্যাক। এরপর সে পায় স্মিট আর স্মিউল নামের দুটো বাজারিগার, তারপর কচ্ছপ গোবিন্দ আর সব শেষে মার্মালেড বেড়াল শিয়ার্কান। সোফির মা শেষ বিকেলের আগে কাজ থেকে বাড়ি ফেরেন না আর জাহাজে চেপে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়ানোর কাজে তার বাবা বড্ড বেশি বাড়ির বাইরে থাকেন বলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাকে দেয়া হয়েছে এই জন্তুগুলো।

স্কুল ব্যাগটা মেঝেতে ছুড়ে ফেলল সোফি, তারপর শিয়ার্কানের জন্য বের করল এক বাটি বেড়ালের খাবার। এরপর সে রান্নাঘরের একটা টুলের ওপর বসে পড়ল রহস্যময় চিঠিটা হাতে নিয়ে।

কে তুমি? সোফির কোনো ধারণা নেই। অবশ্যই সে সোফি অ্যামুন্ডসেন, কিন্তু কে সে? ব্যাপারটা সে আসলে ভেবে দেখেনি, অন্তত এখন পর্যন্ত।

তাকে একটা অন্য নাম দেয়া হলে কী হতো? ধরা যাক, অ্যানি নুটসেন। সে কি তখন অন্য একজন হয়ে যেত?

হঠাৎ তার মনে পড়ল বাবা আসলে তার নাম রাখতে চেয়েছিল লিলেমোর। সোফি ভাবতে চেষ্টা করল লিলেমোর অ্যামুন্ডসেন হিসেবে হাত মেলাচ্ছে আর নিজের পরিচয় দিচ্ছে সে, কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই এগোল না। আরেকটি মেয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে যেতে থাকল।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠল সে, গোসলখানায় ঢুকে পড়ল অদ্ভুত চিঠিটা হাতে নিয়ে। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর তাকাল তার নিজের চোখের দিকে।

'আমি সোফি অ্যামুন্ডসেন', বলল সে।

---

১. Budgeriger,টিয়া পাখির মতো দেখতে, প্রধানত উজ্জ্বল সবুজ রঙের অস্ট্রেলীয় পাখি - অনুবাদক।

আয়নার মেয়েটা একটু মুখ বাঁকানো ছাড়া আর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না। সোফি যা করে, সে-ও ঠিক তাই করে। সোফি তার প্রতিচ্ছবিকে হারানোর জন্য খুব ত্বরিত গতিতে নড়ে উঠল একবার, কিন্তু অন্য মেয়েটা ঠিক তার মতোই দ্রুত।

তুমি কে? জিজ্ঞেস করল সোফি। এ-প্রশ্নেরও কোনো জবাব পেল না সে, তবে ক্ষণিকের জন্য তার বুঝতে অসুবিধে হলো প্রশ্নটা সে করেছে নাকি তার প্রতিবিম্ব।

সোফি আয়নার ভেতরের নাকটার ওপর তার তর্জনী চেপে ধরে বলল, 'তুমি হচ্ছো আমি।'

কথাটায় কোনো সাড়া না পেয়ে বাক্যটা সে ঘুরিয়ে বলল এবার, 'আমি হচ্ছি তুমি।' নিজের চেহারা নিয়ে মাঝে মাঝে অসন্তুষ্টিতে ভোগে সোফি। তাকে অনেকবারই বলা হয়েছে যে তার চোখ দুটো সুন্দর, পটলচেরা, কিন্তু সেটা সম্ভবত এই কারণে বলা যে তার নাকটা খুব ছোট আর মুখটা বেশ একটু বড়। আর তার কান দুটো চোখের খুব কাছাকাছি। সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হচ্ছে তার সোজা চুল, যা দিয়ে কোনো কিছু করা অসম্ভব। মাঝে মাঝে, ক্লদ দেবুসি-র কোনো গান শোনার পর, বাবা তার চুলে হাত বুলিয়ে তাকে 'শনের চুলের মেয়ে' বলে ডাকতেন। তিনি তা বলতেই পারেন, তাকে তো আর সোজা চুল দিয়ে

জীবনযাপন করার সাজা দেয়া হয়নি। মুস (mousse) কিংবা স্টাইলিং জেল, কোনো কিছুই একবিন্দু পরিবর্তন আনতে পারেনি সোফির চুলে। মাঝে মধ্যে নিজেকে সোফির এতো কুৎসিত লাগে যে তার মনে হয় সে কোনো ত্রুটি নিয়ে জনেছিল কিনা। তার মা তো প্রায়ই বলেন ওর জন্যের সময় তাকে কী ভীষণ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু কার চেহারা কেমন হবে সেটা কি এর ওপরই নির্ভর করে? ব্যাপারটা কি খুব উদ্ভট নয় যে সে জানে না সে কে? আর এটাও কি খুব যৌক্তিক যে সে দেখতে কেমন হবে সে-ব্যাপারে তার নিজের কোনো মতামত নেয়া হয়নি? তার চেহারাটা তার ওপর স্রেফ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। সে তার বন্ধু-বান্ধব পছন্দ করে নিতে পেরেছে, কিন্তু নিশ্চয়ই নিজেকে বেছে নেয়নি।

মানুষ আসলে কী?

আয়নার মেয়েটার দিকে ফের মুখ তুলে তাকাল সোফি।

'আমি বরং ওপরে গিয়ে আমার বায়োলজি হোমওয়ার্ক কর ', প্রায় কৈফিয়তের সুরে বলল সোফি হল ঘরে বেরিয়ে আসার পর সে ভাবল, না, তারচেয়ে বরং বাগানে যাই।

'কিটি, কিটি, কিটি!'

বেড়ালটাকে তাড়িয়ে বাইরে বাড়ির দোরগোড়ার সিঁড়ির ধাপে নিয়ে এলো সোফি, তারপর বন্ধ করে দিল দরজাটা।

এক চিন্তা এসে ভর করল তার ওপর। নিজেকে তার মনে হলো একটা পুতুলের মতো, একটা জাদুদণ্ড বুলিয়ে যার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করা হয়েছে। ঠিক এই মুহূর্তে সে যে পৃথিবীর বুকে চমৎকার এক অভিযানে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটা কি সত্যিই এক অসাধারণ ব্যাপার নয়!

হালকা চালে লাফিয়ে নুড়ি-বিছানো পথটা আড়াআড়িভাবে পেরিয়ে গিয়ে শিয়ার্কান ঢুকে পড়ল একদঙ্গল লাল-কিশমিশ ঝোপের ভেতর। কী প্রাণবন্ত একটা বেড়াল, ওর মসৃণ শরীরের সাদা জুলফি থেকে পাকানো লেজের ডগা

পর্যন্ত শক্তির স্ফুরণ পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। এই বাগানে এখন এই বেড়ালটাও আছে, কিন্তু সোফি যেমন নিজেকে নিয়ে ভাবছে, শিয়ার্কান তো মোটেই করছে না।

---

২. Claude Debussy, ১৮৬২-১৯১৮. ফরাসি সুরস্রষ্টা-অনুবাদক ।

বেঁচে থাকা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করতেই সোফি উপলব্ধি করতে থাকে চিরদিন সে বেঁচে থাকবে না। সে ভাবল, আমি এখন এ-পৃথিবীতে আছি, কিন্তু একদিন চলে যাবো।

মৃত্যুর পরে কি কোনো জীবন আছে? বেড়ালটা ভাগ্যবান, এই প্রশ্নটা নিয়েও একবিন্দু মাথাব্যথা নেই ওর।

সোফির দাদি মারা গেছেন বেশি দিন হয়নি। ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে প্রতিদিনই তার কথা মনে হয়েছে সোফির। এটা খুবই বাজে ব্যাপার যে জীবন ফুরিয়ে যায়।

নুড়ি-বিছানো পথের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে সোফি। বেঁচে থাকা নিয়ে আরও বেশি করে ভাববার চেষ্টা করে, যাতে সে যে একদিন বেঁচে থাকবে না এ-কথাটা ভুলে যেতে পারে সে। কিন্তু তা সম্ভব হলো না। যখনই সে এ-মুহূর্তে বেঁচে থাকার বিষয়টাতে মনোযোগ দিল, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর চিন্তাও এসে পড়ল তার মনের মধ্যে। উল্টোভাবেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটল; একদিন যে সে মারা যাবে এই ব্যাপারে একটা তীব্র অনুভূতি মনের মধ্যে সৃষ্টি করার মাধ্যমেই কেবল সে উপলব্ধি করতে পারল বেঁচে থাকাটা কী অসাধারণ রকমের ভালো একটা জিনিস। ব্যাপারটা যেন একটা মুদ্রার দুটো পিঠ আর, মুদ্রাটা সে বারে বারে উল্টে দিচ্ছে। সেটার একটা পিঠ যতই আরও বড় আর স্পষ্ট হয়ে উঠছে, অপর পিঠটাও হয়ে উঠছে তত বড় আর ততই স্পষ্ট।

সে ভাবল, একদিন যে মারা যেতেই হবে সেটা উপলব্ধি না করে কারো পক্ষে বেঁচে থাকার ব্যাপারটা বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। কিন্তু এ-কথাটাও ঠিক যে, বেঁচে থাকাটা যে কী অসম্ভব রকমের আশ্চর্যের একটা ব্যাপার সেটা না ভেবে এটা উপলব্ধি করা অসম্ভব যে আমাদেরকে একদিন মরতে হবে। সোফির মনে পড়ল দাদি অনেকটা এধরনেরই একটা কথা বলেছিলেন যেদিন ডাক্তার তাকে প্রথম বললেন যে তিনি অসুস্থ। দাদী বলেছিলেন, ঠিক এই মুহূর্তটির আগে আমি

বুঝতে পারিনি জীবন কত সমৃদ্ধ। ব্যাপারটা কী দুঃখজনক যে অসুস্থ হওয়ার পরেই কেবল বেশিরভাগ লোক বুঝতে পারে বেঁচে থাকাটা কত বড় একটা উপহার। আর নয়ত তাদেরকে একটা রহস্যময় চিঠি পেতে হয় ডাকবাক্সের ভেতর!

এখন বোধহয় তার গিয়ে দেখা উচিত আর কোনো চিঠি এলো কিনা। গেটের কাছে ছুটে গিয়ে সবুজ ডাকবাক্সের ভেতর তাকাল সোফি। সেখানে ঠিক প্রথমটার মতোই আরেকটা সাদা খাম দেখে চমকে গেল সে। কিন্তু সোফি নিশ্চিত প্রথম চিঠিটা যখন সে নিয়েছিল তখন বাক্সটা খালি ছিল! এ-খামটার ওপরেও তার নাম লেখা । মুখ ছিড়ে খামটা খুলল সে, তারপর ভেতর থেকে বের করল সেই প্রথমটার আকারের একটা চিঠি ।

তাতে লেখা

পৃথিবীটা কোথা থেকে এলো?

আমি জানি না, ভাবল সোফি। নিশ্চয়ই কেউ-ই আসলে জানে না সেটা। কিন্তু তারপরেও, সোফির কাছে মনে হলো এটা একটা সঙ্গত প্রশ্ন। জীবনে এই প্রথমবারের মতো সে উপলব্ধি করল যে পৃথিবীটা কোথা থেকে এলো এ-ব্যাপারে অন্তত প্রশ্ন না করে পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটা ঠিক নয়। রহস্যময় চিঠি দুটাে সোফির মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। সে ঠিক করল গুহায় গিয়ে বসবে।

গুহাটা সোফির খুবই গোপনীয় একটা লুকানোর জায়গা। সে যখন খুবই রেগে থাকে, খুবই কষ্টে থাকে, কিংবা খুবই খুশিতে থাকে তখন ওখানে যায় সে। আজ স্রেফ হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে সে।

অনেকগুলো ফ্লাওয়ার বেড, ফলের ঝাড়, নানান ধরনের ফলের গাছ, একটা গ্লাইডার আর ছোট্ট একটা কুঞ্জ এ-সব নিয়ে বড়ো একটা বাগান লাল বাড়িটাকে ঘিরে আছে; জন্মের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ওঁদের প্রথম সন্তান মারা গেলে দাদা এই কুঞ্জটা তৈরি করে দিয়েছিলেন দাদিকে। বাচ্চাটার নাম ছিল

মেরি। ওর কবরের ফলকে লেখা আছে; ছোট্ট মেরি এসেছিল মোদের কাছে, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের সে আবার চলে গেছে।

ব্যাসপ্‌বেরি ঝাড়গুলোর পেছনে, বাগানের এক কোনায় ঘন একটা ঝোপ আছে, ফুল বা বেরি কোনো কিছুই জন্মায় না ওখানে। আসলে ওটা একটা পুরনো বেড়া, একসময় জঙ্গলের সীমানা নির্দেশ করত, কিন্তু গত বিশ বছরে ওটা কেউ ছেটে-টেটে দেয়নি বলে ওটা এখন জট পাকানো দুর্গম পিণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাদি প্রায়ই বলতেন, যুদ্ধের সময় মুরগিগুলো যখন বাগানের মধ্যেই অবাধে ঘোরাফেরা করত তখন ওই ঝোপটার কারণেই শেয়ালের পক্ষে মুরগি চুরি করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সোফি ছাড়া আর সবার কাছেই ওটা বাগানের অন্য কোনার খরগোশের খোপগুলোর মতোই অদরকারি হয়ে পড়েছিল। তবে সেটা কেবল এই কারণে যে তারা সোফির গোপন রহস্যটা জানতে পারেনি।

সোফির স্মরণ নেই ঝোপটার গায়ের ছোট্ট ফোকরটার কথা সে কখনো মনে করতে পারত না কিনা। ওটার ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিলে ঝোপের ভেতরে একটা গহবরের মধ্যে এসে পড়ে সে। জায়গাটা ছোট্ট একটা বাড়ির মতো। ও জানে, কেউই তাকে খুঁজে পাবে না এখানে।

খাম দুটো দুহাতে আঁকড়ে ধরে বাগানের মধ্যে দিয়ে দৌড় দেয় সোফি, উবু হয়ে বসে ঢার হাত-পায়ে, তারপর পোকার মতো ঢুকে পড়ে বেড়ার ভেতর দিয়ে। গুহাটা এতো উঁচু যে ও প্রায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু আজ সে দুমড়ে যাওয়া কিছু শেকড়ের একটা স্তূপের ওপর বসে পড়ল। এখান থেকে লতা-পাতার ক্ষুদে ক্ষুদে ছিদ্রের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকাতে পারছিল সে। ছিদ্রগুলো কোনোটিই যদিও ছোট্ট একটা পয়সার চেয়ে বড় নয়, তবুও গোটা বাগানটা দিব্যি দেখতে পাচ্ছে সে। ছোটবেলায় মা-বাবা ওকে যখন গাছ-গাছালির মধ্যে খুঁজে বেড়াতেন, ও দেখে খুব মজা পেত।

এই বাগানটাকে সোফি সব সময়ই তার একান্ত নিজের জগৎ বলে ভেবে এসেছে। বাইবেলের নন্দনকাননের কথা শুনলেই সে ভাবত যে বসে বসে সে তার ছোট্ট স্বর্গটা নিরীক্ষণ করছে।

পৃথিবীটা কোথা থেকে এলো?

বিন্দুমাত্র ধারণা নেই ওর এ-ব্যাপারে। সোফি কেবল জানে পৃথিবীটা মহাশূন্যের একটা ছোট্ট গ্রহ। কিন্তু এই মহাশূন্যটাই বা এলো কোথা থেকে?

এমনও হতে পারে যে মহাশূন্যটা সবসময়ই ছিল; সেক্ষেত্রে তাকেও আর বার করতে হবে না সেটা কোথা থেকে এলো। কিন্তু তার মনের ভেতরের কোনো একটা কিছু এ-ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বসল। যা কিছু বর্তমান রয়েছে সে-সবের নিশ্চয়ই একটা শুরু ছিল? কাজেই মহাশূন্যও নিশ্চয়ই কোনো এক সময়ে অন্য কিছু থেকে সৃষ্টি হয়েছিল।

কিন্তু মহাশূন্য যদি অন্য কোনো কিছু থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে সেই অন্য কিছুও নিশ্চয়ই কিছু একটা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। সোফির মনে হলো প্রশ্নটা সে কেবল দীর্ঘ-ই করে যাচ্ছে। কোনো এক পর্যায়ে কোনো একটা কিছু নিশ্চয়ই শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? সেটা কি ওই ব্যাপারটির মতোই অবাস্তব নয় যে আগাগোড়াই পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল? ওরা স্কুলে শিখেছে পৃথিবী ঈশ্বরের সৃষ্টি। নিজেকে সোফি এই বলে সান্ত্বনা দিতে চাইল যে এটাই সম্ভবত পুরো সমস্যাটার সবচেয়ে ভালো সমাধান। কিন্তু তারপরই আবার চিন্তায় পেয়ে বসল তাকে ঈশ্বর যে মহাশূন্য সৃষ্টি করেছেন এটা সে মেনে নিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের নিজের বেলা? তিনি কি নিজেই নিজেকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন? তার মনের গভীর থেকে আবার কে যেন প্রতিবাদ করে উঠল। সব ধরনের জিনিস ঈশ্বর তৈরি করতে পারলেও নিজেকে অন্তত তিনি তৈরি করতে পারতেন না যদি না সে-কাজটা করার আগে নিজেকে তৈরি করার জন্য তার একটা সত্তা থাকত। কাজেই বাকি থাকে কেবল একটাই মাত্র সম্ভাবনা ঈশ্বর সবসময়ই

ছিলেন। কিন্তু ধারণাটা যে সে এরই মধ্যে বাতিল করে দিয়েছে। অস্তিত্বশীল সব কিছুরই একটা শুরু থাকতেই হবে ।

ওহ, অসহ্য!

আবার খুলল সে খাম দুটো ।

কে তুমি?

পৃথিবীটা কোথা থেকে এলো?

কী বিরক্তিকর দুটো প্রশ্ন! তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার, এই চিঠি দুটোই বা কোথা থেকে এলো? এ-ব্যাপারটাও প্রায় একই রকম রহস্যময়।

তার রোজকার অস্তিত্ব থেকে বাইরে ছুড়ে ফেলে কে সোফিকে দাঁড় করিয়ে দিল মহাবিশ্বের বিশাল বাঁধাগুলোর সামনে?

তৃতীয়বারের মতো ডাকবাক্সের কাছে ফিরে গেল সোফি। ডাকপিয়ন মাত্র কিছুক্ষণ আগে দিয়ে গেছে আজকের ডাক। বাক্সের ভেতর হাতড়ে জাংক মেইলের একটা বড়োসড়ো তাড়া, কিছু সাময়িকপত্র আর তার মায়ের কাছে আসা গোটা দুয়েক চিঠি বের করল সোফি। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এক সমুদ্র-সৈকতের ছবিঅলা একটা পোস্টকার্ডও ছিল ওখানে। কার্ডটা ওন্টাল সে। সেটার গায়ে নরওয়ের একটা ডাকটিকেট আর জাতিসংঘ বাহিনীর একটা পোস্টমার্ক । বাবার কাছ থেকে আসেনি তো চিঠিটা? কিন্তু তিনি তো রয়েছেন একেবারেই ভিন্ন একটা জায়গায়, তাই না? তাছাড়া হাতের লেখাটাও তার নয়।

পোস্টকার্ডটা কার নামে এসেছে তাই দেখে সোফির নাড়ির গতি বেড়ে গেল খানিকটা হিল্ডা মোলার ন্যাগ, প্রযত্নে সোফি অ্যামুন্ডসেন, ৩ ক্লোভার ক্লোজ... । ঠিকানার বাকি অংশে কোনো ভুল নেই। কার্ডটাতে লেখা

প্রিয় হিল্ডা, শুভ ১৫শ জন্মদিন। আশা করি তুই বুঝতে পারবি, আমি তোকে এমন একটা উপহার দিতে চাই যা তোকে বড় হয়ে উঠতে সাহায্য করবে।

সোফির প্রযত্নে কার্ডটা পাঠানোর জন্য দুঃখিত। কিন্তু এটাই ছিল সবচেয়ে সহজ পথ। বাবার শুভেচ্ছা রইল।

এক ছুটে বাড়ির ভেতরে, রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল সোফি। তার মনের মধ্যে ঝড় বইছে। কে এই হিল্ডা যার জন্মদিন ওর নিজের জন্মদিনের ঠিক এক মাস আগে?

টেলিফোনের বইটা বের করল সোফি। মোলার নামে অনেক লোক আছে ওখানে, ন্যাগ নামেও আছে বেশ কয়েকজন। কিন্তু গোটা ডিরেক্টরিতে মোলার ন্যাগ নামে কেউ নেই।

রহস্যময় কার্ডটা আরও একবার খুঁটিয়ে দেখল সোফি। মোটেই জাল মনে হচ্ছে না ওটাকে একটা ভাকটিকেট আর পোস্টমার্ক আছে খামটার গায়ে।

জন্মদিনের একটা কার্ড একজন বাবা সোফির নামে পাঠাবেন কেন, যখন সেটা নিশ্চিতভাবেই অন্য জায়গায় যাওয়ার কথা? এ আবার কেমনতর বাবা যিনি তার নিজের মেয়েকে ধোকা দেন তার জন্মদিনের কার্ডটা ইচ্ছে করে ভুল ঠিকানায় পাঠিয়ে? এটা কী করে সবচেয়ে সহজ পথ হয়? আর সবচেয়ে বড় কথা, সে কী করে খুঁজে পাবে হিল্ডা নামের এই মেয়েটিকে?

কাজেই সোফিকে এখন আরেকটা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। সে তার চিন্তা-ভাবনাগুলোকে গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল...

আজ বিকেলে, মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যে, তিনটে সমস্যা উপহার দেয়া হয়েছে তাকে। প্রথম সমস্যা হচ্ছে কে তার চিঠির বাক্সে দুটো সাদা খাম রেখেছে। এই খামগুলোর মধ্যে কঠিন যে-প্রশ্নগুলো আছে সেটা দ্বিতীয় সমস্যা। আর তৃতীয়টি হচ্ছে, এই হিল্ডা মোলার ন্যাগ কে হতে পারে আর তার জন্মদিনের কার্ড সোফির নামে পাঠানো হলো কেন। সে নিশ্চিত, এই তিনটে সমস্যার মধ্যে একটা

যোগাযোগ আছে, তার কারণ, আজকের আগ পর্যন্ত সে নিতান্তই সাদামাটা একটা জীবন কাটিয়েছে।